আমার বন্ধুরা

শুভজীৎ নাথ

আমার নাম রাকেশ অগ্নিহোত্রী। সেট্টি গ্রুপ অব কোং ৫০ পার্সেন্ট পার্টনারশিপে রয়েছি। কাজের সুত্রেই এক ব্যাক্তির সাথে পরিচয় হয়। সে পেশায় মনবৈজ্ঞানিক। খুব তাড়াতাড়ি তার সাথে ঘনিষ্টতা বেড়ে ওঠে। একদিন তার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হই আর সেখানে একটা ঘটনা ঘটে। এরপরেই আমার অতীত জীবনের এক আশ্চর্য ঘটনা রোমন্থিত হয়ে ওঠে। সেই ঘটনাই আমি তোমাদের কাছে বলতে যাচ্ছি। আমার বয়স তখন কুড়ি, ভবানীপুর কলেজ থেকে ট্রান্সফার হয়ে আচার্য শিবরঞ্জন কলেজে ভর্তি হই। প্রথমে ভবানীপুর কলেজে ফিজিওলজি অনার্স নিয়ে পড়তাম, দুবছর পর বিষয়টিতে আগ্রহ না পেয়ে শিবরঞ্জন কলেজে অংক নিয়ে ভর্তি হই। আমার পড়াশুনার ব্যাপারে আমার বাড়ি থেকে কেউ হস্তক্ষেপ করত না। তবে বাড়ির সকলে যে আমাকে সাপোর্ট করত তাও নয়। আসলে বাবা আমার ভবিষ্যৎ আমার উপরে ছেড়ে দিয়ে ছিল। আর বাড়ির অন্যদের তেমন কেয়ার করতাম না। তাই আমার সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ তারা শ্রেয় বলে মনে করত না। যাই হোক আমি আচার্য নিরঞ্জন কলেজে ভর্তি হলাম। এই কলেজের পরিবেশটা খুব সুন্দর। এই জায়গাটা শহরের অন্তর্গত হওয়াতে সবে মাত্র নতুন নতুন রাস্তা বাড়ি অফিস সব গড়ে ওঠার কাজ চলছে। কলেজটা একটু সাবেকি আমলের, প্রায় একশ বছর তো হবেই মেরামত করে বাড়িটিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে প্রচুর গাছ রয়েছে। পড়াশুনার দিক থেকে ও নিয়মকানুনের দিক থেকেও কলেজের নাম ভাল আছে। কলেজের পিছনে ক্যাম্পাসের বাইরে হস্টেল ছিল। হস্টেলে থেকে আমি পড়াশুনা চালাতে লাগলাম। আমার ব্যাগে সবসময়ে একটা ধারল ছুরি ও একটা সাইকেলের চেন থাকত। আগের কলেজে ইউনিয়ন করতাম কিনা। তবে পরপর দুবছর রেজাল্ট বাজে করার ফলে ইউনিয়নের মায়া ত্যাগ করলেও এগুলির মায়া ত্যাগ করতে পারলাম না। কলেজে আমি তেমন কারুর সাথে কথা বলতাম না। কিন্তু তবু আমার তিনটি বন্ধু হল - ত্রিদীপ, মানস ও দীপিকা। এরা প্রত্যেকেই হল কলেজে প্রথম সারির ছাত্র ছাত্রী। ত্রিদীপ ও মানস আমার সাথেই আমার হস্টেলে থাকত আর দীপিকা থাকত পাশের গার্লস হস্টেলে। আমার এই তিনটি বন্ধুও নিজেদের মধ্যে ছাড়া আর কারুর সাথে কথা বলত না। তা সত্ত্বেও কি করে যে এদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হল তা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমার ক্লাস করতে ভাল লাগত না। ওরা জোর করে আমায় ক্লাস করাত। আমরা একসাথে পড়াশুনা করতাম, ঘুরতে যেতাম। আস্তে আস্তে আমাদের বন্ধুত্বটা ভালই জমে উঠল। হস্টেল থেকে একটু দূরে একটা ভাঙা বাড়ি ছিল, তিনতলা। বাড়িটার মেঝে বা ছাদ নেই, বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গেছে। কিন্তু বাড়িটার সিড়ি আর বারান্দগুলি ভালো আছে। সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি

তিনতলায় উঠে যাওয়া যায়। বিকালে ওরা ওই বাড়িতে যেত। দীপিকার সাথে একদিন ওই বাড়িটায় গিয়েছিলাম। দেড়তলায় উঠতেই আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি বললাম, তোরা যে তিনতলায় উঠিস কিভাবে কে জানে ? শুনে দীপিকা আমার কথায় খুব হেঁসে ছিল। আর বলেছিল, তুই নাকি আবার ছুরি কাঁচি নিয়ে ঘুরিস ! দেখতে দেখতে প্রথম বর্ষের পরীক্ষা চলে আসে। আমার প্রস্তুতি ভালো ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধুদের বন্ধুত্বে ও ভগবানের আশির্বাদে ফলাফল ভালই হল। আমার ফলাফল দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছিল। তোদের ঋন যে আমি কি করে শোধ করব, শুনে দীপিকা বলেছিল ঋন মনে করলে শোধ করতে পারবি কিনা জানিনা তবে বন্ধুত্ব মনে করলে অবশ্যই করতে পারবি। সত্যিই খুব ভাগ্য ভাল থাকলেই তবে এমন বন্ধু পাওয়া যায়। আমাদের দিনগুলি খুব আনন্দে কাটত। কিন্তু আমার ওই বন্ধুগুলির একটা সমস্যা ছিল। মানস অত্যন্ত সাদাসিধা ছেলে, ঝামেলা থেকে দূরে থাকত। যেখানে প্রতিবাদ করলে ঝামেলা হবে সেখানে অন্যায়র প্রতিবাদ পর্যন্ত করত না। এই সুযোগটা নিয়েছিল আমাদের হস্টেলের একটা ছেলে, রঞ্জিত। ও ভীষণভাবে মানসকে টর্চার করত। রাতের বেলা ভুতের ভয় দেখান, গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা, একবারতো মানসকে বালিশ চাপা দিয়ে দমবন্ধকর অবস্থা করেছিল। মানসের শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।কিন্তু তাও সে কাউকে নালিশ করেনি। আর দীপিকার সমস্যা ছিল সৎবোন। তারা দীপিকাকে একদম দেখতে পারত না। এমনকি ওকে ওর বাবার থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়। পরে দীপিকার বাবাও ওকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। তাই কলেজের কাছাকাছি বাড়ি থাকার সত্ত্বেও ও হস্টেলে চলে আসে। আর ত্রিদীপ একটা মেয়েকে ভালবাসত, মেয়েটি আমাদের কলেজেই পড়ে, নাম শ্রাবনী। এদের দুজনের মধ্যে কাঁটাহয়ে দাঁড়িয়েছিল সূর্য্য। প্রচন্ড অহংকারী ও বেপরোয়া সূর্যের ভয়ে ত্রিদীপ ও শ্রাবনী একে অপরের থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হত। কারন এরা একসাথে হলেই সূর্য্য নিশ্চই কারুর ক্ষতি করত।

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলে এল। এখন আর আমার পড়াশুনায় অতটা ভয় নেই। আমার বন্ধুদের সান্নিধ্যে থেকে আমিও পড়াশুনায় মন দিয়েছি। পরীক্ষা হয়ে গেল, ফলাফলও বেরল, ফার্স্টক্লাস পেলাম। আমার তিন বন্ধুও পাশ করল তবে আমার চেয়ে বেশি নম্বর নিয়ে।

দেখতে দেখতে দিন এগিয়ে চলল। আমার জীবনে এমন একটা দিন আসবে ভাবতে পারিনি। প্রথম ঘটনাটা ঘটলো ১৯ অক্টোবর। রঞ্জিত কাউকে কিছু না বলে হস্টেল থেকে বেরিয়েছিল কিন্তু আর ফেরেনি। পুলিশ এসে জিজ্ঞাসা করেও কোন কুল কিনারা পেল না। সন্দেহ ভাজনও কাউকে পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ২৩ শে নভেম্বর। এবার নিখোঁজ হল দীপিকার সৎবোন তৃপ্তি। একই ভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কিন্তু আর ফেরেনি। ওর

বাবা মা পরে পুলিশে রিপোর্ট করে। পুলিশ অনেক তদন্ত করেও কোন সফলতা পায়নি। প্রথমে অবশ্য দীপিকাকে অনেক জেরার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমান না থাকায় ও কলেজে রেকর্ড ভালো থাকায় ও মুক্তিপায়। এর পরের ঘটনা ঘটে ১৮ই ডিসেম্বর, সূর্য্য নিখোঁজ। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বলে গিয়েছিল এক বোঝাপড়া আছে। একজনকে একটা জিনিস ফেরত দেওয়ার আছে। তবে সে আর ফেরেনি। কার সাথে কি বোঝাপড়া ও জিনিসটা কি কোনটা জানা গেল না। তাই পুলিশও ফাইলটা বন্ধ করে দিল। আমার বেশ ভালই লেগেছিল, আমার তিন বন্ধুর পথের কাঁটা একসাথে সরে গিয়েছিল। সবচেয়ে ভাল হল দীপিকার। ওর বাবা মায়ের আর সন্তান না থাকায় ও হয়ে উঠল ওর বাবা মার চোখের মণি। কিন্তু আশ্চর্যও হয়েছিলাম কারন তিন তিনটে মানুষ এইভাবে কিকরে উধাও হয়ে গেল। আমার বন্ধুরাও কিরকম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কারুর সাথে কথা বলত না। এভাবে ওদের পথের কাঁটা সরে যাবে ওরাও চায়নি। আমার বন্ধুরা কেউ কারুর সাথে আর তেমন কথা বলত না। আমাদের আর একসাথে পড়াশুনা করা হত না। ঘোরা হত না। আমি অনেক চেষ্টা করেও আমাদের বন্ধুদের এক করতে পারিনি। দেখতে দেখতে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা চলে এল, আমরা চারজনেই খুব ভাল রেজাল্ট করলাম। ওই শেষ দেখা আমাদের চার জনের মধ্যে।

এখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। সেদিন আমার মনবৈজ্ঞানিক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে যে আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে সেটি হল, আমি যাওয়া মাত্রই দেখি একটি খুব চেনা লোক সোফাতে বসে। আমার বন্ধুটি অবশ্য বলেছিল যে ওর একটা পেশেন্ট বাড়িতে আসবে। তবে কোথায় দেখেছি এই লোকটাকে ? আরে মানসতো। মানসও সাথে সাথে বলে উঠল, আরে রাকেশ না । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছিস? কি করছিস ? বাকিদের খবর কিছু জানিস। ও বলল ও ভাল আছে আর বাকি বন্ধুরাও ভাল আছে। আমি একটু অভিমান করেই বললাম যে, সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ আছে শুধু আমার সঙ্গেই কারুর যোগাযোগ নেই। আসলে তোর অনেকদিন কোন খোঁজ পাইনাতো, মানস বলল। আর কথা হল না, কম্পানি একটা ব্যাপারে ফোন আসাতে আমায় চলে যেতে হল। যাওয়ার সময় অবশ্য মানসের ফোন নং নিয়ে নিলাম।

কিছুদিন পর আমার তিন বন্ধুকে নিমন্ত্রন করলাম আমার বাড়িতে। দেখতে দেখতে সেইদিনটিও চলে এল। সবাই এল, এসে আমাকে দেখে বলল ভালই উন্নতি করেছিস। এতো তোদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। না হলে আমি যে পথে চলেছিলাম . . . . বলে আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম। তারপর সবাইকে এক সাথেই জিজ্ঞাসা করলাম তোরা এখন কি করছিস ? দীপিকা প্রতমেই উত্তর দিল আমি খান্না ইন্ডাষ্ট্রির এম ডি। ত্রিদীপ বলল, আমি

এখন রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল। বাঃ এত খুব ভাল কথা আমি বললাম, মানসকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলল ও একটা ম্যাথামেটিকাল রিসার্চ সেন্টারের সাথে যুক্ত। তবে তুই সেদিন মনবৈজ্ঞানিকের বাড়িতে কি করছিলিস ? মানস বলল, সম্প্রতি প্রচন্ড ডিপ্রেশানে ভুগছিলাম, কিন্তু এখন ঠিক আছি। একটু পরে খাবার চলে এল, সবাই খেতে বসলাম।

আমার বাড়ির পিছনে একটা বড় ধরনের সুন্দর লন ছিল, তার পিছনেই বড় ঝিল। খাওয়ার পর আমরা লনে গিয়ে বসলাম। কতদিন পরে আমরা এক জায়গায় হলাম। আগে আমরা একসাথে কত ঘুরেছি। পড়াশুনা করেছি, গল্প করেছি, আজ আমি যা সব এদের জন্য। আর আমাদের ভাগ্য আমাদের আলাদা করে দিয়েছিল। তবে ভাগ্য আমাদের আবার এক সাথে করেছে। এই ভেবেই আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমরা সারা দুপুর গল্প করে কাটালাম। সূর্য্য বিকেলের দিকে এলিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে পাখির কলরব কানে আসছে। হঠাৎ আমি প্রশ্নটা করে বসলাম, এই তিনজনের নিখোজ হয়ে যাওয়ার পর তোরা এমন চুপচাপ হয়েগিয়েছিলিস কেন ? তিনজনকে তোরা তো একেবারে পছন্দ করতিস না। আর ওরা চলে যাওয়াতে তো তোদের ভালই হয়েছে। কথাটা শোনা মাত্রই তিনজোড়া চোখ আমার দিকে বিষ্ফারিত হয়ে রইল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, ঝিলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ শুধু কানে আসছে। আমি বললাম থাক অসুবিধা থাকলে বলিস না। না না কোন অসুবিধা নেই, শোন তবে। দীপিকাই প্রথম শুরু করল।

২৩ শে নভেম্বর বিকালে আমি হস্টেল থেকে ঘুরে যেখানে হাইওয়েটা হচ্ছিল সেখানে ঘুরতে গিয়েছিলাম। গিয়ে তৃপ্তীর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আমার মায়ের একটা পুঁতির নেকলেস আছে। ওটাই মায়ের শেষ স্মৃতি। দেখি তৃপ্তী ওটা গলায় পরে রয়েছে। ওর সাথে কথা এককথায় দুকথায় ঝগড়া লেগে যায়। রাগের মাথায় ওর গলার নেকলেসটা ধরে একটান মারি, নেকলেসের নাইলনের সুতোটা তৃপ্তীর গলার নলী ছিন্ন করে দেয়। আর তৃপ্তীর নিষ্প্রান দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমার ভয়ে দিকবিদিক কোন জ্ঞান থাকল না, আমি তাড়াতাড়ি হস্টেলে পালিয়ে আসি। এসে মনে পড়ে আমি পার্সটা ওখানে ফেলে এসেছি। আমার প্রচন্ড ভয় হয়। যদি কেউ জানতে পারে তাহলে আর রক্ষা নেই। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে তৃপ্তীর লাশ ও আমার পার্শ কোনটাই পাওয়া যায়নি।

এই বলে দীপিকা চুপ করল। সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। এর পর মানস শুরু করল, ১৯ শে অক্টোবর সকলে রঞ্জিত আমার পেছনে লাগতে গিয়ে হস্টেল কেয়ার টেকারের কাছে ভীষণভাবে বকা খায়। বিকালে রঞ্জিত আমাকে হস্টেলের বাইরে একা পেয়ে ছুরি নিয়ে তড়াও হয়। তাড়া খেয়ে আমি হস্টেল থেকে একটু দুরে যে নতুন চারতলা ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছিল তার

ছাদে ওঠে যাই। তার সত্বেও ও আমার পিছন ছাড়ে না। আমার গলায় একটা চেন ছিল, হাতাহাতির সময়ে ওটা ছিঁড়ে যায়। নিরুপায় হয়ে আমি একটা চেলা কাঠ তুলে রঞ্জিতের দিকে চালাই। কাঠের মাথায় একটা পেরেক ছিল, সেটা ওর গলায় গেঁথে যায়। কাঠটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই মুহূর্তের মধ্যে রঞ্জিতের গলার নলীটা ছিন্ন হয়ে যায়। রঞ্জিতের দেহটা মাটিতে পড়ে কাঁপতে থাকে পরে থেমে যায়। আমি প্রায় ছুটে হস্টেলে ফেরত আসি। হস্টেলে ফিরে মনে হয় আমার চেনটাতো রঞ্জিতের হাতে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য রঞ্জিতের লাশ বা আমার চেন কোনটাই পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার জন্য আমার ডিপ্রেশান শুরু হয়। এই পর্যন্ত বলে মানস থামে। আমার বন্ধুরা এক এক করে ঘটনা বলছে আর আমার মেরুদন্ড দিয়ে হীম স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এবার ত্রিদীপ শুরু করল, আমি শ্রাবনীকে একটা লকেট দিয়েছিলাম, তাতে আমার ও শ্রাবনির ছবি ছিল। সূর্য্য সেটা জানতে পেরে আমাকে একদিন রেললাইনের ধারে ভাঙা বাড়িতে ডাকে একটা এস. টি. ডি. বুথ থেকে পোন করে। আমি বিকালে ওর সাথে দেখা করতে যাই। গিয়ে প্রথমে ঝগড়া ও পরে হাতাহাতি আরম্ভ হয়। মারি ওকে এক ধাক্কা। একতলা ছাদ থেকে পড়ে কেউ মরে না । কিন্তু ওখানে কিছু লোহার রড দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। একটা রড সূর্য্যের মাথার পিছন থেকে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। একেবারে স্পট ডেড। আমি বাড়িটা থেকে নেমে হস্টেলে চলে আসি। পরে আমার মনে পড়ে আমার লকেটটা এর পকেটে রয়ে গিয়েছে। আমি আবার সেখানে যাই কিন্তু লাশ গায়েব।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। নাম না জানা অসংখ্য পাখি বাসায় ফিরছে। আমি ভেবেছিলাম আমাকে হয়ত কেউ ব্ল্যাকমেল করবে কিন্তু এত বছর হয়েগেল তবুও কিছুই হল না। ত্রিদীপ এইটুকু বলে চুপ করল। আমার বন্ধুগুলি যে এই রকম কাজ করতে পারে ভাবলেউ রক্ত হিম হয়ে যায়। তাহলে আমরা চারজন এই ঘটনাগুলি জানি। আমি বললাম। দীপিকা বলল, হ্যাঁ আমাদের যখন আবার যোগাযোগ হয় আমরা সব ঘটনাই একে অপরকে বলি, আর একন তোকে বললাম। আরও একজন এই ঘটনাটা জানে। আমি বললাম কে, ত্রিদীপ বলল যে বা যারা লাশ আর প্রমান সরিয়েছে। তবে সে যেই হোক না কেন আমাদের ভীষণ উপকার করেছে। আমাদের জীবনের কালো দিনগুলি মুছে দিয়েছে।

রাত হল, সবাই লন থেকে উঠে পড়লাম। ছিক হল আমরা যেদিন ছুটি পাব সে দিনই একসাথে আনন্দ ফুর্তি করব। এই বলে ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমার বন্ধুরা চলে যেতেই আমি আলমারি খুলে কিচু জিনিস দেখলাম আর মনে মনে হাসতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে পড়ে রয়েছে মানসের চেন, দীপিকার পার্স আর ত্রিদীপের লকেটটা। আমার

পাঠক বন্ধুরা ভাবতে পারেন যে এগুলি আমার কাছে এল কি করে , তবে প্রথম থেকেই বলি।

১৯ শে অক্টোবর, আমি যে ভাঙাবাড়ির দেড়তলায় উঠতে ভয় পেতাম সেদিন বিকাল বেলায় আমি ওই বাড়ির তিনতলায় উঠি। সেখান থেকে মানসের সমস্ত ঘটনা নিজের চোখে দেখি। মানস আমাকে দেখতে পায়নি। ও চলে যেতেই আমি ওই বাড়িতে পৌঁছাই। তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ব্যাগ থেকে ছুরিটা বার করে রঞ্জিতের দেহটা টুকরো টুকরো করে বস্তায় পুরে পাশে একটা হাইব্রিড মাগুর ভর্তি পুকুরের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। ছাদের রক্ত বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়। মাথাটা নিয়ে চলে যাই যেখানে সেই অঞ্চলের ময়লা ফেলা হত সেখানে। আশে পাশে ভাল করে দেখে নিয়ে একটা গর্ত খুড়ে মাথাটাকে মাটি চাপা দিয়ে চেনটা নিয়ে হস্টেলে ফিরে আসি।

আর ২৩ সে নভেম্বর আমিও হাইওয়ের দিকে ঘুরতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে একটা ঝোপের ধার দিয়ে দীপিকা প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি সেই ঝোপের ধারে পৌঁছাতেই দেখি তৃপ্তী লাশ পড়ে রয়েছে। আমার বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগল না। তৃপ্তীর লাশটা হাইওয়ের ধারে যে মাটি পড়ছে সেখানে কয়েকটা মাটির ঢেলা সরিয়ে চাপা দিয়ে দিলাম। তৃপ্তীর লাশ পাওয়া যায়নি। যাবেই বা কি করে, প্রতিদিন টন টন মাটি আর উপর সুড়কি , পিচ পড়েছে। আমাকে ওই কাজ করতে কেউ দেখেনি। কারণ ওই দিকটায় লোকজন তেমন একটা চলাচল করে না।

এর পরের ঘটনা ১৮ই ডিসেম্বর। বাবার শরীর খারাপ, আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম রেল লাইনের পাশের রাস্তাটা ধরে। এদিকে খুব একটা কেউ আসেনা। তবে স্টেশনে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে বাড়িতে ত্রিদীপ ও সূর্য্যের হাতাহাতি । হঠাৎ সূর্য্য এক ধাক্কা দিল আর সূর্য্যের মাথাটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়েগেল। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম ত্রিদীপ চলে যেতেই আমি সূর্যের কাছে গেলাম, নাঃ আর বেঁচে নেই, তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে ছুরিটা বের করে মাথাটা আলাদা করে দি তারপর সমস্ত পকেট হাতড়ে সবকিছু বার করে নি। পাশদিয়ে তখন একটা কয়লার মালগাড়ি যাচ্ছিল। সিগনাল না পেয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে যায়। দেহটা ক্ষতবিক্ষত করে একটা ডিবেতে তুলে দি। মাথাটা ব্যাগে পুরে আর লকেটটা নিয়ে চলে আসি। আমার বাড়ি যেতে একটা নদী পড়ে, মাথাটা নদীতে ফেলে দি। দুমাস পরে পেপারে দেখেছিলাম একটা মস্তকহীন দেহ পাওয়া গিয়েছে তবে সেটা শনাক্ত করা যায়নি। নিখোঁজ হওয়া ব্যাক্তি আর কোন প্রমান না পাওয়ায় আমার বন্ধুরা রেহাই পেল। ঠিক করেছি না ভুল করেছি জানিনা। তবে আজ তারা যে পদমর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছে এই ঘটনা সবার সামনে চলে আসলে তারা এই সন্মান ও মর্যাদা পেত না । এই ভেবেই খুব

আনন্দ লাগে। আর একটা কারনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। সমস্ত ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটানোর জন্য আর এই পাশবিক কাজ করার উপযুক্ত সাহস যোগানোর জন্য।।

(সমাপ্ত)